ইসলামের জন্ম, বিকাশ ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্র

আকাশ মালিক

(প্রকাশিতব্য বইয়ের একটি প্রবন্ধ)

(১)

কোরায়েশ বংশের দুই শাখায় নবী মুহাম্মদ (দঃ) ও হজরত ওসমানের (রাঃ) জন্ম। তাঁদের দুজনরেই পূর্বপুরুষ আবদে মনাফ। আবদে মনাফের দুই পুত্র ছিলেন : আবদে শামস ও আবদে হাশিম। আবদে শামসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র উমাইয়া নেতৃত্বের দাবি করায় চাচা আবদে হাশিমের সাথে বিবাদ বাঁধে। এই বিবাদে কোরায়েশ বংশ দুই দলে বা গোত্রে বিভক্ত হয়ে যায়; হাশিমি গোত্র ও উমাইয়া গোত্র। বিবাদের মূল কারণ সম্পদ। শেষ পর্যন্ত নেতৃত্ব ভাগাভাগি করা হয় এইভাবে—কাবা গৃহের স্বত্তাধিকার ও তত্বাবধান এবং হজ (দেব-দেবী দর্শন) মৌসুমে আয়কৃত অর্থের মালিকানা থাকবে হাশিমি গোত্রের হাতে। আর দেশ প্রতিরক্ষা-প্রশাসন ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মালিকানা উমাইয়া দলের হাতে। পরবর্তীতে উমাইয়া বংশ বুঝতে পারলো এই ক্ষমতা ভাগাভাগিতে তাদের যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে গেছে। নবী মুহাম্মদের(দঃ) জন্ম পূর্ববর্তী আরবে যুদ্ধবিগ্রহ বা ধর্মীয় জেহাদ তেমন ছিল না বললেই চলে। নগর শাসনে উমাইয়াদের অর্থোপার্জন, কাবা গৃহের আয়ের তুলনায় ছিল অতি নগন্য। ধনে-মানে উমাইয়া গোত্র, হাশিমিদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে পড়লো। কিন্তু তারা সামরিক বিভাগ ও প্রশাসনের মাধ্যমে রাষ্ট্রনীতি, কূটনীতি ও শিক্ষা-দীক্ষায় অনেক এগিয়ে গেল। এবার অর্থনৈতিক সমস্যা দূরীকরণে বুদ্ধিমান উমাইয়াগণ ঝাপিয়ে পড়লো ব্যবসা-বাণিজ্যে। কূটনৈতিক অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তারা যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যে, অর্থোপার্জনে প্রচুর উন্নতি করে, উপরন্তু বহির্বিশ্বের সাথেও সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। উমাইয়া ও হাশিমি দুই দলের মধ্যকার বৈষম্য, বিবাদ, হিংসা-বিদ্বেষ দিনদিন বাড়তে থাকে। আর তা এক পর্যায়ে হাশিমি দলের অন্যতম শক্তিশালী নেতা, একাদশ সন্তানের জনক আব্দুল মোত্তালিবের সময়ে এসে চরমাকার ধারণ করে। আব্দুল মোত্তালিবের পুত্র আব্দুল্লাহ ও আবুতালিবের ঔরসে যথাক্রমে মুহাম্মদ (দঃ) ও হজরত আলির (রাঃ) জন্ম।

উমাইয়ার দুই পুত্র ছিলেন। হারিব ও আবুল আস। হারিবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন আবু সুফিয়ান আর আসের ঘরে হাকাম ও আফ্ফান। ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের যে বছর ইয়েমেনের বাদশাহ আবরাহা মক্কা আক্রমণ করেন, সে বছর হাশিমি গোত্রের আব্দুল্লাহর গৃহে মুহাম্মদ(দঃ)জন্মগ্রহণ করেন। তার ছয় অথবা সাত বৎসর পর উমাইয়া বংশের আফ্ফান পত্নী উর্দির গর্ভে হজরত উসমানের (রাঃ) জন্ম হয়। শিশু বয়সে যেমন মুহাম্মদ(দঃ)পিতা আব্দুল্লাহকে হারিয়ে চাচা আবুতালিবের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হোন, হজরত উসমান (রাঃ) ও কিশোর বয়সে পিতা আফ্ফানকে হারিয়ে চাচা হাকামের আশ্রয় গ্রহণ করেন। উমাইয়া ও হাশিমিদের আত্মকলহ, গোত্রীয় সংঘাত, বহুঈশ্বরবাদ আর ধর্মীয়-উপাসনালয়ের মালিকানা জবর-দখল নিয়ে আরব যখন অবনতির চরম পর্যায়ে তখনই বিপরীতমুখী মুক্তবুদ্ধি এবং উদার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির একদল মুক্তমনার আবির্ভাব ঘটে। যাদের তৎকালীন সময়ে 'হানিফি' নামে আখ্যায়িত করা হতো। মুহাম্মদ (দঃ) তখন যুবক। ওয়ারাকা বিন-নোফেল ও জায়িদ বিন-ওমর ছিলেন সেই 'হানিফি' দলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। 'হানিফি' গোষ্ঠীর দলের সদস্য হলেন মক্কায় জন্মগ্রহণকারী ওবায়দুল্লাহ

বিন জাহস এবং উসমান বিন আল-হুয়ায়রিথ প্রমুখ উল্লেখ্য, এঁদের মধ্যে ওয়ারাকা বিন নোফেল মুহম্মদ (দঃ)-এর প্রথম স্ত্রী হজরত খাদিজার (রাঃ) চাচাতো ভাই ও মুহাম্মদের (দঃ) 'ইসলাম-প্রচারের' ধর্মগুরু; জানা যায়, তিনি খাদিজা ও মুহাম্মদের (দঃ) বিয়ের ঘটকও ছিলেন। জায়িদ বিন ওমর আরবের পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, পরবর্তীতে তিনি এই পৌত্তলিক ধর্মমত ত্যাগ করে একেশ্বরবাদী 'আব্রাহামিয় মতবাদ' গ্রহণ করেন। হানিফি দল এক সময় মক্কার প্রভাবশালী 'পৌত্তলিক ধর্মে'র ওপর প্রকাশ্যে অনাস্থা ঘোষণা করে বসে। ফলে কোরায়েশ বংশের রোষে পড়ে তাদের অনেকেকেই দেশান্তরী হতে হয়। ওবায়দুল্লাহ বিন জাহস প্রাণ বাঁচাতে পার্শ্ববর্তী খ্রিস্টানরাজ্য আবিসিনিয়ায় পালিয়ে যান এবং সেখানে খ্রিস্টান ধর্মমত গ্রহণ করেন; তাঁর স্ত্রী উম্মে হাবিবাকে নবী মুহাম্মদ (দঃ) পরবর্তীতে বিয়ে করেন, এবং উসমান বিন আল-হুয়ায়রিথও কোরায়েশদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে বাইজেন্টাইন রাজ্যে গমন করেন; তিনিও সেখানে খ্রিস্টান ধর্মমত গ্রহণ করেন। ওয়ারাকা বিন-নোফেল ও জায়িদ বিন-ওমর ছিলেন মুহাম্মদের (দঃ) অতি প্রিয়ভাজন। এই দুই ব্যক্তিই ছিলেন পরবর্তীতে মুহাম্মদের (দঃ) নতুন ধর্ম 'ইসলাম' আবিষ্কারের প্রথম ও প্রধান সহায়ক। ওয়ারাকা বিন-নোফেল ছিলেন ইহুদি-খ্রিস্টানদের ধর্মপুস্তক তাওরাত, জবুর ও ইনজিল কেতাবে বিশেষজ্ঞ আর জায়িদ বিন-ওমর ছিলেন একজন কবি ও সাহিত্যিক। কোরআনের কাব্যিক রূপ, ছন্দ ও শব্দচয়ন জায়িদ বিন-ওমরের কাছ থেকে অনেকাংশেই ধারকৃত। মুহাম্মদ (দঃ) হয়তো কিছুটা গরিব পরিবারে থেকে লালন-পালন হয়েছিলেন কিন্তু তিনি 'নিরক্ষর' ছিলেন, এ বিষয় নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট সন্দেহ আছে; কারণ চাচা আবুতালিবের সাথে ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে প্রায়ই শ্যাম (বর্তমান সিরিয়া) সহ বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের সাথী হতেন, এবং ব্যবসার হিসাব-নিকাশের পূর্ণ দক্ষতার কারণেই বিত্তশালী খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী খাদিজা মুহাম্মদের (দঃ) প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ৬১০ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর নতুন ধর্ম 'ইসলাম' ঘোষণা দেন। মক্কা নগরীতে আগুন জ্বলে উঠলো। হাশিমি বংশোদ্ভূত মুহাম্মদের (দঃ) এই নতুন ধর্ম ঘোষণায় অপমানবোধ করলো উমাইয়া দল, আর মুহাম্মদের (দঃ) স্বীয় গোত্রের লোকজন পৌত্তলিকতার অবসানের দুশ্চিন্তায়, দেব-দেবীর কল্যাণে কাবা গৃহ থেকে বিপুল আয়ের পথ বন্ধ হওয়ার আশঙ্কায় হলো উৎকণ্ঠিত। এদিকে হজরত উসমান (রাঃ) চাচা হাকামের সহযোগিতায় ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রচুর উন্নতি করার ফলে দেশ-বিদেশে সুপরিচিতি লাভ করেন। ব্যবসার সূত্র ধরেই একদিন মক্কার ব্যবসায়ী আবু-বকরের (রাঃ) সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

হজরত উসমান (রাঃ) ছিলেন আবেগপ্রবণ, কিছুটা সরল প্রকৃতির সুদর্শন যুবক। ধনে-মানে উসমান (রাঃ) সুখী হলেও মনে-প্রাণে সুখ ছিল না। পিতা আফ্ফানের মৃত্যুর পর তাঁর মাতা উর্দি (ওরয়া) যে লোকটিকে বিয়ে করেন, উসমান (রাঃ) তাকে সহ্য করতে পারতেন না। মনের দুঃখে একদিন ঘর ছেড়ে মক্কায় চলে আসেন। উসমান (রাঃ) মুহাম্মদের (দঃ) প্রথম কন্যা রোকেয়াকে ভালোবাসতেন এবং মনে-মনে তাঁকে বিয়ে করার ইচ্ছে পোষণ করতেন। কিন্তু যখন একদিন শুনতে পেলেন রোকেয়ার বিয়ে অন্যত্র হয়ে গেছে, উসমান (রাঃ) খুবই দুঃখ পেলেন। একদিন সেই দুঃখ মোচনের সুবর্ণ সুযোগটি সৃষ্টি করে দিলেন তাঁর নব্য ব্যবসায়ী বন্ধু আবুবকর (রাঃ)। মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর নতুন ধর্ম 'ইসলাম' ঘোষণার পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমেই চল্লিশ বছর বয়স্কা, দু'বার বিবাহিতা, বিপুল সম্পদের অধিকারিণী খাদিজাকে বিয়ে করেন। মুহাম্মদ (দঃ) ভালোভাবেই জানতেন, বাহুবল ও অর্থবল ছাড়া তাঁর নতুন ধর্ম 'সূতিকা ঘরে'ই মারা

যাবে; যেমনটা হয়েছে হানিফিদের অবস্থা। তাই আপন কন্যাদ্বয়কে আতিবা ও উতবা ইবনে আবুলাহাব নামের দুই অমুসলিম সহোদর ভাইয়ের সাথে বিয়ে দেন। উম্মে-কলসুম বিবাহকালে অপ্রাপ্তবয়স্কা ছিলেন। নবী কন্যাদ্বয়ের বিবাহ ইসলামের শরিয়ত মোতাবেক অবশ্যই ছিল না; কারণ আবু লাহাব বা তার দুই পুত্র ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন না, এমন কি এই ধর্মকে তারা মেনে নিতে পারেননি, তাদের আশঙ্কা ছিল এটি তাদের পূর্বপুরুষের ধর্মের প্রতি হুমকিস্বরূপ। তাই আতিবা ও উতবা মুহাম্মদের (দঃ) নতুন ধর্মের সংবাদ শুনে নবীজির প্রতি তাদের তীব্র ঘৃণাই শুধু প্রকাশ করলো না উপরন্ত তাঁর কন্যাদ্বয়কে তালাক দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিল। মুহাম্মদ (দঃ) অন্তরে খুবই দুঃখ পেলেন কিন্তু কিছু করার শক্তি ছিল না, শুধু অভিশাপ দেওয়া ছাড়া (কোরআন শরিফের 'সুরা লাহাব' দ্রষ্টব্য)। রোকেয়াকে নিয়ে উসমানের (রাঃ) মনের গোপন বাসনা আবুবকর (রাঃ) জানতেন এবং নবী কন্যাদ্বয়ের তালাক হয়ে যাওয়ার সুবাদে 'উসমানের বাসনার' সংবাদটা তিনি (আবু বকর) মুহাম্মদের (দঃ) কানে পৌঁছালেন। মুহাম্মদও এই ধরনের সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। বাহুবল অর্জনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু এবারে অর্থবলের সুযোগটা হাতছাড়া করা যায় না। মুহাম্মদ (দঃ) উসমানকে নবপ্রচারিত ইসলাম ধর্ম গ্রহণের শর্ত মেনে নিলে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি হলেন। উসমান (রাঃ)- ও খুশি মনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে রোকেয়ার সাথে প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। আরবের একটি ধনাঢ্য-সম্ভ্রান্ত পরিবারে, 'সোনার চামচ' মুখে নিয়ে যে উসমানের (রাঃ) জন্ম, সেই উসমান (রাঃ) এমন কাণ্ড করে বসবেন উমাইয়া বংশের কেউ কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি। চাচা হাকামের, ঢাক-ঢোল বাজিয়ে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় উসমানের বিয়ে সম্পন্ন করার সকল স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। নববধূকে নিয়ে তায়েফের রাজপ্রাসাদে উসমানের (রাঃ) আর যাওয়া হলো না। কিছুদিন পরেই তিরস্কার আর অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে মক্কা থেকে বিতাড়িত অনেক নব্য মুসলিম দলের সাথে নববধূকে নিয়ে উসমান পার্শ্ববর্তী খ্রিস্টান রাষ্ট্র আবিসিনিয়ায় গমন করেন। দরিদ্র দেশ আবিসিনিয়ায় উসমান (রাঃ) ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক চেষ্টা করেও তেমন সুবিধা করতে পারলেন না। আবিসিনিয়ায় সুদীর্ঘ আট বছর সীমাহীন দুঃখ-কষ্টের মধ্যে অবস্থানকালে, ৬১৯ খ্রিস্টাব্দে, একদিন রোকেয়ার কাছে খবর আসলো, এককালের আরবের স্বনামধন্যা মহিলা, অফুরন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারিণী, মা জননী খাদিজা অতিশয় অভাব অনটনের মধ্যে রোগাক্রান্ত হয়ে, ঔষধ-পথ্যবিহীন অবস্থায় মারা গেছেন। মাতৃশোকে রোকেয়ার শুধু মনই ভাঙেনি, তাঁর দেহও ভেঙে যায়; তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ (দঃ) কোরায়েশ কর্তৃক তাঁর প্রাণনাশের আশঙ্কায় রাতের অন্ধকারে আবুবকর (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে মদিনাভিমুখে পালিয়ে যান। ইসলামের ইতিহাসে এই ঘটনাকে 'হিজরত' বলা হয় এবং ঐ দিন থেকে পরবর্তীতে হিজরিসন গণনা শুরু করা হয়। তখন মুহাম্মদের (দঃ) বয়স ছিল তিপ্পান্ন আর তাঁর প্রচারিত ধর্মের চলছিল তেরো বছর। মদিনায় এসেই মুহাম্মদ তাঁর এতোদিনকার বৈরাগী লেবাসের অন্তরালে লুকায়িত রাজনৈতিক ইসলাম প্রকাশের প্রস্তুতি নেন। এক হাতে তসবিহ আর এক হাতে তলোয়ার!

(২)

উসমান (রাঃ) হিজরি দুই সনে আবিসিনিয়া থেকে স্বস্ত্রীক মদিনার পথে যাত্রা করেন। পীড়িত, ক্ষীণ স্বাস্থ্যের রোকেয়া তখন গর্ভবতী। পথিমধ্যে তাঁদের একটি পুত্র সন্তান জন্ম নেয় কিন্তু সে শৈশবেই মারা যায়। রোকেয়ার স্বাস্থ্যের অবস্থা দিন-দিন শোচনীয় হতে

থাকে। কিছুদিন পর রোকেয়া যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, মুহাম্মদ (দঃ) তখন তাঁর তের বছরের তৈরি তিনশতো তেরোজন অনুসারী সৈনিক নিয়ে, মদিনা থেকে প্রায় ষাট মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বদর প্রান্তে যুদ্ধরত। মুহাম্মদ (দঃ) সিরিয়া থেকে মক্কাভিমুখী একদল কোরায়েশ বণিকের পথ রুখে দাঁড়ান। যুদ্ধের জন্য মুসলমানগণ পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। হঠাৎ আক্রমণে বণিকদল হতভম্ব হয়ে যায়। বাহক মারফত মক্কার কোরায়েশগণ জানতে পারলো যুদ্ধ ব্যতীত বণিকদলকে মুহাম্মদের হাত থেকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। বদর প্রান্তে সংঘটিত হলো ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম যুদ্ধ। মুসলমানদের পক্ষে স্বয়ং মুহাম্মদ সেনাপতির দায়িত্বে। বদর প্রান্তর সত্তরটি তাজা প্রাণের রক্তে রঞ্জিত হলো। আর এই রক্তের মাঝে খোঁজে পেল কিশোর ইসলাম বেঁচে থাকার, বিকশিত হওয়ার অপূর্ব সাধ। উসমান (রাঃ) সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। সেনাপতি মুহাম্মদ (দঃ) সত্তরজন মানুষকে খুন ও ততোধিক মানুষকে বন্দী করে যুদ্ধে জয় লাভ করেন। বিজয়ীর বেশে গর্বিত সৈন্যদল নিয়ে মুহাম্মদ (দঃ) যখন মদিনায় গৃহে ফিরলেন, রোকেয়া তখন এই পৃথিবীতে আর নেই। রোকেয়ার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করতে হলো, বিজয় উৎসব করা মুহাম্মদের (দঃ) আর হলো না। কিন্তু এই যুদ্ধে তাঁর পূর্ব-পরিকল্পনা (সম্পদ ও ক্ষমতা বিস্তার) বাস্তবায়নের পথে উৎসাহ ও আশা সঞ্চারিত হলো। মুহাম্মদ (দঃ) অতিসত্তর আরেকটি যুদ্ধের আয়োজনে মনোনিবেশ করলেন। আর পত্নী বিয়োগে শোকাহত উসমান (রাঃ) কিছুদিন পরেই পুরোদমে ব্যবসা বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করলেন। ব্যবসায় সুপরিচিত উসমান (রাঃ) পূর্ব অভিজ্ঞতায় রাতারাতি প্রচুর উন্নতি করলেন। এতোদিনে, কিশোর বয়সে তালাক প্রাপ্ত মুহাম্মদের (দঃ) দ্বিতীয় কন্যা উম্মে-কলসুম পূর্ণ যুবতী। উসমান (রাঃ) কলসুমের প্রেমে পড়লেন। নবীজির কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। ধনে-মানে, রূপে-গুণে অতুলনীয় উসমানের (রাঃ) প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হলো। নবী মুহাম্মদের (দঃ) দুই কন্যার পাণি গ্রহণের কারণে উসমান (রাঃ) 'যিন্নুরাইন' অর্থাৎ যুগল নূরের অধিকারী উপাধি পেলেন।

প্রথম যুদ্ধের মাত্র এক বছর পরেই, হিজরি তৃতীয় সনে, মদিনা থেকে ছয় মাইল উত্তর-পূর্বে ওহুদ প্রান্তরে কোরায়েশদের সাথে মুহাম্মদের (দঃ) দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়। এবারে শিশু ইসলাম শুধু রক্তই পান করলো না, যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের অমৃতসাধ ও গ্রহণ করলো। লাগাতার তিনটি যুদ্ধে (বদর, ওহুদ, আহযাব) বিজয়ী মুসলমানগণ প্রচুর সম্পদ লাভ করলেন এবং শত্রুপক্ষের অনেক শিশু-কিশোর, নর-নারীকে বন্দী করতে সক্ষম হলেন। মুসলমানগণ বুঝতে পারলেন: যুদ্ধ একটি অকল্পনীয় লাভজনক ব্যবসা। উসমান (রাঃ) ইসলামের প্রথম যুদ্ধ 'বদর যুদ্ধ' বাদে ওহুদ ও আহযাব যুদ্ধে সেনাপতি মুহাম্মদের (দঃ) পাশে-পাশে ছিলেন। পরাজিত কোরায়শগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেলো। ইসলাম ত্রাসের সৃষ্টি করলো সারা আরববিশ্বে। ষষ্ঠ হিজরিতে মুহাম্মদ (দঃ) বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে বনি-মুস্তালিক গোত্রের ইহুদিদেরকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে ইহুদিগণ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের বহু নারী মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে যায়। নিজ শহরের বাইরে রাতের অন্ধকারে অতর্কিত আক্রমণ 'আত্মরক্ষামূলক' হয় না। মুহাম্মদ কর্তৃক বেশিরভাগ যুদ্ধই ছিল 'অফেন্সিভ'। বনি-মুস্তালিক গোত্র বা সিরিয়া থেকে বাণিজ্য করে বাড়ি ফেরার পথে কোরায়েশ বণিকদল মদিনা আক্রমণ করে নাই। এবারে মুহাম্মদ (দঃ) কোরায়েশদের মন-মানসিকতা ও শক্তি পরীক্ষার লক্ষ্যে চৌদ্দ শত সৈন্যসামন্ত নিয়ে মক্কা নগরী দখলের আয়োজন করলেন। মক্কা শহর থেকে ছয় মাইল দূরে হোদায়বিয়ার উপত্যকায় এসে তারা আর অগ্রসর হলেন না। অনেক দেরিতে হলেও মক্কাবাসী দেখতে পেলো 'সন্ন্যাসী-বৈরাগী'

লেবাসের ভেতরে মুহাম্মদের ভয়ানক রাজনৈতিক চেহারা। এক সাথে চৌদ্দশত সৈনিক নিয়ে মুহাম্মদের (দঃ) আগমন সংবাদ পেয়ে কোরায়েশগণ আগে থেকেই সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিলেন। মুহাম্মদের (দঃ) বার্তা-বাহক হয়ে উসমান (রাঃ) কোরায়েশ নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন যে, তারা যুদ্ধ করতে আসেননি, এসেছেন কাবা ঘর দর্শন করতে! কোরায়েশদের মন থেকে বদরের রক্তের দাগ তখনো শুকায়নি। উসমান (রাঃ)-কে বন্দী করা হলো। খবর পেয়ে মুসলমানগণ ক্ষেপে উঠলেন। নবীজির হাতে হাত রেখে মৃত্যু-শপথ নিলেন, মক্কা জয় না করে তারা ফিরে যাবেন না; ইসলামের ইতিহাসে এই শপথ 'বাইয়্যাতে রেজওয়ান' নামে অভিহিত। হজ (দেব-দেবী দর্শন) উপলক্ষে বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত কতিপয় উপজাতীয় নেতাদের হস্তক্ষেপে আপাতত দুইপক্ষ মারাত্মক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেল। তারা উভয়পক্ষের মধ্যে একটি সন্ধি স্থাপন করতে সক্ষম হলেন, যা ঐতিহাসিক 'হোদাইবিয়া সন্ধি' নামে পরিচিত। আরব বিশ্বে মুহাম্মদের (দঃ) নেতৃত্বে একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী অপ্রতিরুদ্ধ এক বিরাট মুসলিম বাহিনী গড়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত তারা বিনা যুদ্ধে ৬৩০ খ্রিস্টাব্দের ১১ জানুয়ারি তারিখে মক্কা নগরী দখল করে নেন। বদর থেকে তবুকের যুদ্ধ পর্যন্ত দশ বছরের মধ্যে কমপক্ষে নয়টি যুদ্ধে মুহাম্মদ (দঃ) সেনাপতির দায়িত্বে ছিলেন। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে আরাফাতের ময়দানে তিনি তাঁর শেষ ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এই ভাষণের দুই মাস পরেই ৬৩ বছর বয়সে আল্লাহর রসুল (?) মুহাম্মদ (দঃ) ইহলোক ত্যাগ করেন। উল্লেখ্য, তখন আবু-বকর তনয়া, নবীজির প্রিয় পত্নী আয়েশার বয়স আটারো।

(৩)

মুহাম্মদের (দঃ) মৃত্যুর পরপরই অগণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা দখল করে বসেন মুহাম্মদের সর্বকনিষ্ঠ এবং প্রিয় পত্নী আয়েশার পিতা হজরত আবুবকর (রাঃ)। ক্ষমতার মোহে মক্কা থেকে পালিয়ে আসা কোরায়েশ নেতাগণ মদিনার আনসারিদের কথা ভুলে গেলেন। মদিনাবাসীর কোনো দাবি ও প্রতিবাদ তারা কানেই তোললেন না। মদিনার মুসলমান নেতা হজরত সাদ (রাঃ) পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, খলিফা নির্বাচিত হবে মদিনার আনসারিদের ভেতর থেকে। মদিনাবাসী শেষ পর্যন্ত মক্কার একজন এবং মদিনার একজন করে দুই খলিফা মেনে নিতে রাজি হলেন। তাদের এ দাবিও প্রত্যাখ্যান করা হলো। মদিনার ঘরে-বাইরে হিংসার আগুন জ্বলে উঠলো। হজরত আলি ও মুহাম্মদের কনিষ্ঠ কন্যা হজরত ফাতিমা (রাঃ) আবুবকরকে (রাঃ) প্রথম থেকেই খলিফা হিসেবে মেনে নিতে পারেননি। মুহাম্মদের (দঃ) মেয়ে ফাতিমা (রাঃ) ও তাঁর চাচা আব্বাস (রাঃ) মুহাম্মদের (দঃ) মালিকানায়, মদিনা ও খায়বারে রক্ষিত কিছু সম্পত্তি দাবি করায় এ নিয়ে আবুবকরের সাথে তাদের মনোমালিন্য দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত প্রায় ছয় মাস পর বিভিন্ন সামাজিক দিক চিন্তা করে আলি (রাঃ) আবুবকরের (রাঃ) খেলাফত মেনে নেয়ায় ঐ বিষয়টি চাপা পড়ে যায়। আবুবকরের শাসনামলে, মুহাম্মদের (দঃ) সময়ের জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত মানুষগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। অমুসলিম সরকারগণ তাঁদের ওপর অন্যায়ভাবে আরোপিত 'জিজিয়া' কর দিতে অস্বীকার করলো। মুহাম্মদ কর্তৃক সৃষ্ট দশ বছরের সংঘাতময় অশান্তির জীবন থেকে মানুষ মুক্তি চাইলো। অনেক নব্য মুসলমান তাদের পূর্ববর্তী ধর্মে ফিরে গেলো। বাহরাইনের শক্তিশালী বনু-বকর গোত্রের লোকজন (যারা প্রাণ রক্ষার্থে মুহাম্মদের (দঃ) সময়ে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল) প্রকাশ্যে ইসলাম ত্যাগ করলো। অম্মান বংশীয় লোকেরাও ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দিল।

আবুবকর (রাঃ) জনগণের ওপর স্বৈরাচারী স্টিমরোলার চালিয়ে দিলেন। সেনাপতির দায়িত্বে নিয়োগ করলেন দুর্ধর্ষ সাহাবি খালিদ বিন অলিদকে (রাঃ)। উল্লেখ্য, 'মুতা' যুদ্ধে যায়েদ নামক, মুহাম্মদের (দঃ) এক ক্রীতদাস নিহত হয়েছিলেন; এর প্রতিশোধ নিতে মুহাম্মদ (দঃ) সিরিয়া আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তাঁর (মুহাম্মদের) মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পূর্বে। মুহাম্মদের (দঃ) সেই অসম্পূর্ণ কাজটি পূর্ণ করতে, আবুবকর (রাঃ) প্রথমেই আক্রমণ করলেন সিরিয়ার ওপর। ইরানের খসরু পারভেজ, যিনি একসময় মুহাম্মদকে (দঃ) বন্দী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, আবুবকর (রাঃ) তাঁকেও শায়েস্তা করার লক্ষ্যে ইরান আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিলেন। অনেক মুসলমান নেতাগণ এই আক্রমণের বিরোধিতা করেছিলেন। আবুবকরের (রাঃ) নির্দেশে খালিদ বিন অলিদ (রাঃ) বেপরোয়া হয়ে আরবের একের পর এক গোত্রের ওপর নৃশংস আক্রমণ চালাতে থাকেন। এক সাথে আবুবকরের (রাঃ) জঙ্গি কমান্ডারগণ ছড়িয়ে পড়েন চতুর্দিকে; বাহরাইনে গেলেন আলা বিন হাদরামি, ইরানের দক্ষিণ সীমান্ত থেকে বাইজেনটাইন পর্যন্ত খালিদ বিন অলিদ ও ইরাকের উত্তর সীমান্তে আয়াজ বিন গানম। মাত্র দুই বছরের স্বৈরশাসনে আবুবকর গোটা আরবকে এক রণক্ষেত্রে পরিণত করেন। মৃত্যুর পূর্বে নিজের পছন্দমত নিযুক্ত করে যান আরেকজন স্বৈরাচারী শাসক। ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)। ওমর (রাঃ) মসনদে বসেই ইরাক ও ইরান নামক দুটি দেশকে একেবারে তছনছ করে দিলেন। খালিদ বিন অলিদের চেয়েও ভয়ঙ্কর, উবায়েদ, তালহা, যোবায়ের, আব্দুর রহমান, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ও মোতানার মতো সন্ত্রাসীদের হাতে তুলে দেন সামরিক ভার। ইরাক ও ইরানের কতো শত জীব, কতো মানুষ আর পশু যে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমরের তলোয়ারের নিচে প্রাণ দিয়েছিল তার সঠিক হিসাব হয়তো কেউ কোনোদিন আর জানতে পারবে না। মৃত্যুর পূর্বে ওমর (রাঃ) তাঁর নিজের ও আবুবকরের স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন আব্দুর রহমান বিন আউফ ও তাঁর (ওমরের) পুত্র আব্দুল্লাহর হাতে। তারা দুইজন অন্ধকার ঘরে গোপন বৈঠক করে নিয়ে এলেন মুহাম্মদের দুই কন্যার স্বামী সত্তর বছর বয়স্ক উসমানের (রাঃ) নাম। হজরত আলি (রাঃ) চিৎকার করে বললেন 'না-আমি মানি না, এটা প্রহসন, ধর্মের নামে মিথ্যাচার, অন্যায়, এটা প্রতারণা!'

আরবি নববর্ষ, হিজরি ২৪ সনের মহরমের পহেলা তারিখ, ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দের ৭ নভেম্বর উসমান (রাঃ) ইসলামের তৃতীয় খলিফা হিসেবে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। উসমানের খেলাফত লাভে যারপর নাই খুশি হলো মক্কার উমাইয়াগণ, বিব্রতবোধ করলো হাশিমিগণ। পরপর তিনজন খলিফা ক্ষমতায় আসার পর, মক্কা থেকে আগত শরণার্থীদের দূরাভিসন্ধি সম্বন্ধে অভাগা মদিনাবাসীদের বুঝতে বাকি রইলো না। তারা বুঝতে পারলো, কোরায়েশগণ মদিনা দখল করে নিয়েছে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় মদিনাবাসীর কোনো স্থান নেই। এতদিন পরেও মুহাম্মদের (দঃ) কথিত 'সাম্যবাদী' ইসলাম মক্কা-মদিনার মুসলমান ও উমাইয়া-হাশিমিদের ভেতরকার বৈষম্য দূর করতে পারলো না। উসমানের খেলাফতের মাধ্যমে এবার ইসলামের ঘরে অনলের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠলো, যা হজরত আয়েশার (রাঃ) যুগে এসে দাবানলে পরিণত হয়। এই প্রবেন্ধর শেষভাগে তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হবে।

উসমান (রাঃ) ক্ষমতা লাভের পরপরই এক বিরাট কাণ্ড করে বসেন। অন্যান্য বিখ্যাত সাহাবিদের মতে যা ছিল মুহাম্মদের (দঃ) রচিত সংবিধান 'আল-কোরআনে'র পরিপন্থী।

খলিফা উসমানকে একসাথে তিনটি খুনের এক আসামীর বিচার করতে হয়। দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের (রাঃ) ছেলে হজরত ওবায়দুল্লাহ একদিনে তিনটি নিরপরাধ মানুষকে খুন করেছিলেন। ঘটনাটি ছিল এরকম: হজরত ওমরের কাছে, ফিরোজ আবু লুলু নামের এক ব্যক্তি, তার ওপর আরোপিত করের পরিমাণ কমানোর আবেদন জানায়। পারসিয়ান দেশের ফিরোজকে মুসলমানগণ এক যুদ্ধে বন্দী করে দাস হিসেবে বিক্রি করেছিলেন। দাসত্ব হতে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে ফিরোজ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে পরবর্তীতে খ্রিস্টধর্মে ফিরে যায়। হজরত ওমর ফিরোজের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। কুফায় বসবাসকারী ফিরোজ কাঠমিস্ত্রি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতো। সে মদিনায় চলে আসে। একদিন ওমরকে নির্জন মসজিদে পেয়ে ছুরি দিয়ে ছয়টা আঘাত করে এবং সে নিজেও আত্মহত্যা করে। ছুরিকাঘাতে আহত হওয়ার তিনদিন পর ওমর (রাঃ) মারা যান। পরদিন হজরত ওমরের ছেলে ওবায়দুল্লাহ, প্রথমে পারস্য থেকে আগত হরমুজান ও হজরত সাদের (রাঃ) ক্রীতদাস জুফাইনাকে খুন করেন। হরমুজান ও জুফাইনাকে খুন করে ওবায়দুল্লাহ ফিরোজের বাড়িতে যান। ফিরোজকে না পেয়ে তার মেয়েকে তিনি খুন করেন। দ্বিতীয় খলিফা ওমর-পুত্র দ্বারা সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের বিচার বসলো। পৃথিবী আজ এত বড় নৃশংস হত্যার ইসলামি আইনের সুবিচার দেখবে। খলিফা উসমানের মুখের দিকে চেয়ে আছে মজলুম ওয়ারিশগণ। কোরআন-হাদিস সামনে নিয়ে বসেছেন হজরত আলি সহ বেশ কয়েকজন শরিয়া বিশেষজ্ঞ সাহাবি। (অবশ্য কোরআন-হাদিস তখনো পুস্তাকাকারে ছিলনা; মুহাম্মদের মুখের কথা ও কাজ যে যেভাবে শুনেছেন, বুঝেছেন, দেখেছেন তা'ই শরিয়ার আইন বলে মানতেন।) গণরায় হয়েই গেছে। ফিকাহ শাস্ত্রকারগণ একমত যে, খলিফা হজরত ওমরের পুত্র ওবায়দুল্লাহর নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড হবে; কারণ, নিহত তিন ব্যক্তির একজন পারস্য থেকে আগত হরমুজান ছিলেন মুসলমান। শরিয়ত অনুযায়ী একজন মুসলমানকে হত্যা করলে হত্যাকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। দ্বিতীয়জন একজন সাহাবির ক্রীতদাস। তৃতীয়জন একজন নারী, যে খলিফা ওমরের খুন সম্বন্ধে কিছুই জানে না। হজরত আলি (রাঃ) অপরাধী ওবায়দুল্লাহর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দেয়ার পক্ষে তার অভিমত প্রকাশ করলেন। সাহাবি হজরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) ও তাঁর মতো, হজরত ওমরের তৈরি কয়েকজন নামকরা ঘাতক সন্ত্রাসী বিচার চলাকালীন সময়ে দাঁড়িয়ে হজরত আলির দেয়া রায়ের প্রতিবাদ করলেন। খলিফা উসমান (রাঃ) কোরআন-হাদিস অনুসরণ করলেন না। শরিয়া আইন ও বিশ্ববিবেককে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হজরত ওবায়দুল্লাহকে দণ্ডমুক্ত করে দিলেন। ওমরের (রাঃ) আত্মীয়স্বজন বেজায় খুশি হলেও দুঃখিত হলো মদিনাবাসী। এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে মদিনার বিখ্যাত মুসলিম কবি যিয়াদ ইবনে লবিদ খলিফা উসমান, ঘাতক ওবায়দুল্লাহ ও শরিয়া আইনের ওপর ব্যঙ্গ করে এক কবিতা রচনা করলেন, লোকে প্রকাশ্যে মদিনার রাস্তায়-রাস্তায় সেই কবিতা আবৃত্তি করলো অনেক দিন।

কিছুদিন পরেই মদিনায় খাদ্যাভাব দেখা দিল। ডাকাতি আর লুটের মালের গুদাম শূন্য হতে চলেছে। রাষ্ট্র আর চলে না। সবচেয়ে বেশি বিপদের সম্মুখীন হলো মদিনাবাসী। তারা পেশায় ছিল কৃষিজীবী। লুটের ব্যবসায় অভ্যস্থ ছিল না, তাই তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতো না। গনিমতের মাল (নারী ও সম্পদ) তাদের ভাগ্যে জুটতো না। পক্ষান্তরে মক্কার কোরায়েশগণের জীবিকা ছিল মেষ-ছাগল চড়ানো ও কাবা ঘরের সেবাযত্ন করা। আজ কোরায়েশগণ ইরান, ইরাক, সিরিয়া, মিশরসহ সারা আরব-বিশ্বের প্রায় প্রতিটি এলাকায় কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারি পদে অধিষ্ঠি। মেষ পালক-পুরোহিত থেকে

রাষ্ট্রনায়ক। প্রায় স্বপ্নের মতোই বদলে গেল আরবের মানচিত্র। দখলকৃত দেশে দেশে কোরায়েশ শাসকগণ অগণিত ক্রীতদাসীভোগ, অবাধ সম্পদের প্রাচুর্যে বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো। মদিনা থেকে উসমানের (রাঃ) কেন্দ্রীয় সরকার উপযুক্ত ট্যাক্স পাঠাতে চিঠি লিখলেন দখলকৃত রাজ্যের গভর্নরদের কাছে। কিছুকিছু এলাকার অমুসলিম সরকারগণ ট্যাক্স পাঠানোতো দূরের কথা, তারা ইসলামি শাসন অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করলো। স্বয়ং মুসলিম সরকার, মিসরের গভর্নর হজরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) উসমানের (রাঃ) চিঠির উত্তরে লিখলেন : 'উষ্ট্রী এর বেশি দুধ দিতে অপারগ'। তিনিই সাহাবি হজরত আমর ইবনুল আস, যিনি হজরত ওমরের খুনি পুত্র ওবায়দুল্লাহকে শাস্তি না দেয়ার জন্য খলিফা উসমানকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। খলিফা উসমান (রাঃ) ভীষণ রাগান্বিত হলেন। তিনি হজরত আমর ইবনুল আসকে পদচ্যুতির আদেশ দিলেন। তাঁর স্থলে পৌর্ট সাঈদের সামরিক শাসনকর্তা আবদুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবি সারাহকে সমগ্র মিশরের গভর্নর পদে নিযুক্ত করেন। প্রসঙ্গত এখানে হজরত আবদুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহ সম্পর্কে পূর্বের একটি ঘটনার বর্ণনা দেয়ার প্রয়োজনবোধ করছি: মক্কা বিজয়ের পর মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর কয়েকজন (আট/দশজন) সঙ্গী-সাথী, সহকর্মী ও এককালের শুভাকাঙ্ক্ষীদের তালিকা তৈরি করলেন। আবদুল্লাহ্ বিন সাদ বিন আবি সারাহ তাদের একজন। তাদেরকে হত্যা করা হবে; কারণ মুহাম্মদের (দঃ) সন্দেহ হলো এরা একদিন তাঁর 'নবীত্ব' ও 'ধর্ম'কে মিথ্যা প্রমাণিত করে ফেলবে। আবদুল্লাহ্ বিন সাদ বিন আবি সারাহ মুহাম্মদের (দঃ) মুখে বলা কোরআন লিখে রাখতেন। মুহাম্মদ (দঃ) মাঝে মাঝে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে ঘটনায় কিছুকিছু পরিবর্তন করে ফেলতেন, এবং আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ সেটা ধরে ফেলতেন। আবদুল্লাহ্ বিন সাদের কপাল ভাল যে, হজরত উসমান বিষয়টি আগে টের পেয়েছিলেন। আবদুল্লাহ ছিলেন হজরত উসমানের দুধভাই (Foster Brother)। হজরত উসমান মোহাম্মদের (দঃ) কাছে আবদুল্লাহ বিন সাদের প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন। মুহাম্মদের (দঃ) আদেশ পেয়ে ঘাতক শাণিত তরবারি হস্তে শিরোপরে দণ্ডায়মান ছিল। কিন্তু মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর দুই মেয়ের স্বামী, জামাতা উসমানের অনুরোধ উপেক্ষা করে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারলেন না। আবদুল্লাহ বিন সা'দ (রাঃ) প্রাণ ভিক্ষা পেলেন। মুহাম্মদের (দঃ) এক সময়ের প্রীয়ভাজন ও বিশ্বস্ত কোরআন লেখক আবদুল্লাহ বিন সাদের (রাঃ) অপরাধের প্রমান আজও কোরআনেই আছে। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আল্ বাদাওয়ী তাঁর তাফসীর-গ্রন্থ 'আছরারুত্ তান্জীল ওয়া আছরারুত্ তা'য়ীল' (The Secrets of Revelation and The Secrets of Interpretation' edited by H. O. Fleischer. 2 vols., Leipzig, 1846-1848; indices ed. W. Fell, Leipzig, 1878) এ বর্ণনা করেন- একদিন মুহাম্মদ (দঃ) সুরা আলমুমিনুন এর ১২ থেকে ১৪ পর্যন্ত বাক্যগুলো লিখার জন্যে আবদুল্লাহ বিন সা'দকে বললেন। বাক্যগুলো ছিল-

'আর আমরা নিশ্চয়ই মানুষকে সৃস্টি করেছি কাদার নির্যাস থেকে'। (আয়াত ১২)

'তারপর আমরা তাকে বানাই শুক্রকীট এক নিরাপদ অবস্থান স্থলে'। (আয়াত ১৩)

'তারপর আমরা শুক্রকীটকে তৈরী করেছি একটি রক্তপিন্ডে, তারপর রক্তপিন্ড থেকে মাংশপিন্ড তৈরী করেছি, তারপর 'মাংশপিন্ড থেকে হাড় তৈরী করে, অতঃপর হাড়গুলোকে মাংশ দ্বারা আবৃত করেছি। অবশেষে তাকে নতুন রুপে দাঁড় করিয়েছি'। (আয়াত ১৪)

মুহাম্মদ (দঃ) ১৪নং বাক্য এতটুকু বলার পর আবদুল্লাহ বিন সা'দ তার সাহিত্যিক ভাষায় বলে উঠলেন -'নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়'। মুহাম্মদ (দঃ) বললেন,'এই বাক্যটাও লাগিয়ে দাও'। আবদুল্লাহ বিন সা'দ হতবাক হয়ে গেলেন। মনে

মনে বললেন বিষয়টা কি, আমার মুখের কথা আল্লাহর বাণী হয় কিভাবে! আবদুল্লাহ নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে. কোরআন মুহাম্মদ লিখছেন, এসব কোন ঐশী-বাণী নয়। তিনি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে মুহাম্মদ থেকে দূরে সরে গেলেন। (আরো পড়ুন- "Asbaab Al-Nuzool" *by Al-Wahidi Al-Naysaboori - Page 126 - Beirute's Cultural Libary Edition* "Tub'at Al-Maktabah Al-thakafiyyah Beirute")

এবার এখানে সাহাবি হজরত আমর ইবনুল আসের (রাঃ) পরিচিতি জেনে নিলে পরবর্তী ঘটনা ঝুঝতে সুবিধা হবে। হজরত ওমর (রাঃ) যখন ইরাক দখলের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, লোকে বললো, আবুবকরের (রাঃ) আমলের সেনাপতি খালিদ বিন অলিদ (রাঃ) ছাড়া ইরাক দখল করা সম্ভব হবে না। দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রাঃ) বললেন, খালিদ বিন অলিদের চেয়েও বিচক্ষণ শক্তিশালী সেনাপতি আমার আছে। তিনি হজরত আমর ইবনুল আসের প্রতিই ইঙ্গিত করেছিলেন। আমর ইবনুল আস শুধু ইরাকই নয়, পশ্চিম সিরিয়া, জেরুজালেমও দখল করে নেন। হজরত ওমর খুশি হয়ে তাকে মিশর দখল করার দায়িত্ব দেন। মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে আমর ইবনুল আস প্রমাণ করে দিলেন যে, তিনি খালিদ বিন অলিদের চেয়েও পরাক্রমশালী যোদ্ধা। আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে তিনি খলিফা ওমরকে (রাঃ) চিঠি লিখলেন : "আমিরুল মুমেনিন, আজ আমি এমন একটি জাতিকে আপনার দাসত্ব স্বীকারে বাধ্য করিলাম, যারা কোনোদিন পরাধীনতা সহ্য করিতে পারে না। এমন একটি নগরী আপনার পদতলে উপহার দিলাম, যে নগরীতে চার হাজার প্রাসাদ ও চার হাজার হাম্মাম (গোসলখানা) রহিয়াছে। চারশত ভোজনাগার ও প্রমোদালয় আছে, যেখানে এসে গ্রিক-রাজপুত্রগণ পানাহার ও চিত্তরঞ্জন করিতো। এই নগরীর এক প্রান্তে সুপ্রসিদ্ধ সিরাপিয়াম, যার ভিতরে দেবী সিরাপার মন্দির ও আলেকজান্দ্রিয়ার সুপ্রসিদ্ধ পাঠাগার অবস্থিত। অপর প্রান্তে বিখ্যাত সিজারির মন্দির, যাহা মিশর বিজয়ী খ্যাতনামা জুলিয়াস সিজারের সম্মানে রাণী ক্লিওপেট্রা কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল"। চিঠি পেয়ে ওমর (রাঃ) যারপর নাই খুশী হলেন। চৌদ্দমাস যুদ্ধ করে আমর ইবনুল আস (রাঃ) রোম সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র আলেকজান্দ্রিয়া দখল করেন হিজরী বিশ সনে। গ্রিকগণ এ পরাজয় মেনে নিতে পারলো না। তাদের সম্রাট হিরোক্লিয়াসের মৃতুর পর তাঁর মেয়ে, আলেকজান্দ্রিয়া পুনরুদ্ধারের প্রস্তুতি নেন।

চলবে-